VOL- 6, ISSUE 8 , 5TH AUGUST 2017

Rs. 20/-

জ্ঞান-আলোক

পবিত্র ভাব ও অকপট চিত্ত নির্মল আনন্দের আলোকবার্তা বয়ে আনে

A Few Words About Us

The "Jnanbarta Foundation" situated at 38, Surya Sen Street, 2nd Floor, Flat No. 4, Kolkata - 700 009, India, takes the pleasure of introducing itself as a charitable organisation. The foundation aims at creating opportunities for the womenfolk of this country & abroad to prove their worth as successful human beings, in the face of all obstacles; spreading education among the unfortunate adult member of the society who have been deprived of the basics of education ; propagating the thoughts and teachings of great Seers, Sages and preceptors through "Jnanbarta" the mouthpiece of the foundation published as a quarterly periodical in Bengali.

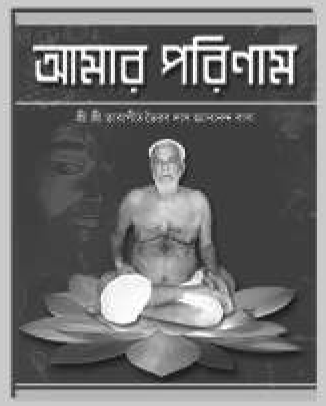

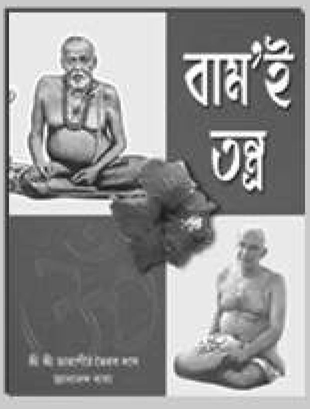

Our Listed Books

We have published a no. of books containing the teachings of Sri Sri Tarapith Bhairabdas Jnananda Baba. The books have been written by his devotees, followers and people who are well established in various fields of life. There are also books written by the great sage himself.

Our Books are :

(1) **Bam -e- Tantra**
(2) **Santir Path**
(3) **Baul Git**
(4) **Nijeke Cheno**
(5) **Bibaha Bises Bohaboho**
(6) **Amar Parinam**
(7) **Tumi KoroTomar Kormo**
(8) **Bharoter Datagrohita**
(9) **Satter Swarup**
(10) **Bamdeb Darshan**

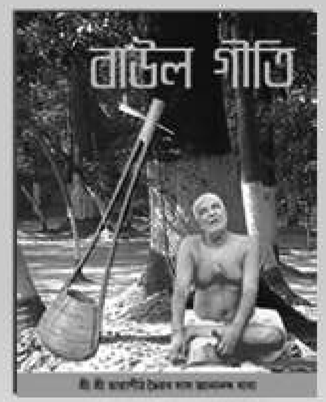

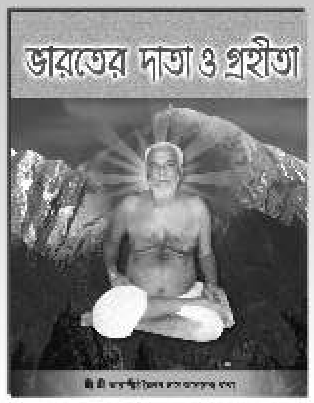

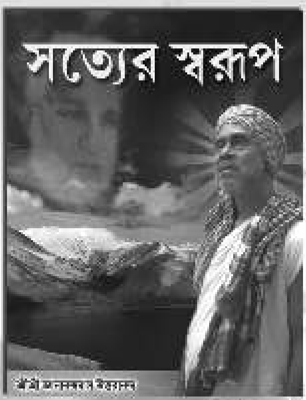

জ্ঞান-আলোক

GYAN-ALOKE (Bengali Monthly)

পবিত্র ভাব ও অকপট চিত্ত নির্মল আনন্দের আলোক বার্তা বয়ে আনে।

AUGUST 2017 Vol. 6, Issue. 8 RNI No. WBBEN/2012/42501 20/-

"মাসিক পত্রিকা" ষষ্ঠ বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৪২৪ - আগস্ট ২০১৭ ২০ টাকা

গুরু কৃপাহি কেবলম্

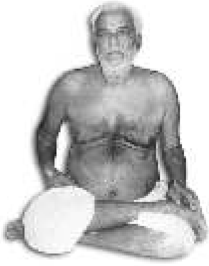

সম্পাদক ঃ

শুচিস্মিতা সেনগুপ্ত

জ্ঞানবার্তা ফাউন্ডেশনের পক্ষে ঃ

বি-১০১, সার্ভে পার্ক, সন্তোষপুর, কলকাতা-৭৫ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত

লোকনাথ ক্রিয়েশন

মণিখোলা, নারায়ণপুর, কোলকাতা-১৩৬ থেকে মুদ্রিত

প্রচ্ছদ ঃ

দি ক্রিসেন্ট মুন

বিক্রয়কেন্দ্র ঃ

জ্ঞানবার্তা ফাউন্ডেশন

৩৮, সূর্য্য সেন স্ট্রীট, কোলকাতা-৯

ফোন ঃ ৯৮৩৬২৭১৯০৬

ওয়েবসাইট ঃ www.jnanbarta.com

ই-মেল ঃ jnanbarta@gmail.com

Printer, Publisher & Editor : Suchismita Sengupta
on behalf of owner JNANBARTA FOUNDATION
Printed at : M/s LOKNATH CREATION,
Monikhola, Narayanpur, Kolkata - 700 136
Published at : B-101 Survey Park, Santoshpur,
Kolkata - 700 075

সমস্ত অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত

জ্ঞান-আলোক
GYAN-ALOKE (Bengali Monthly)
পবিত্র ভাব ও অকপট চিত্ত নির্মল আনন্দের আলোক বার্তা বয়ে আনে।

সূচীপত্র

সম্পাদকের বার্তা ৩

বিশেষ রচনা
মন ভালো নেই
শ্রীশ্রী জ্ঞানানন্দদাস উত্তরানন্দ ৮

ধারাবাহিক
শ্রী তারাক্ষ্যাপা
অনুরাগ চক্রবর্ত্তী ২৬

বামাবতার
শিবানন্দ ২৪

ব্রজবিদেহী মহন্ত মহারাজ
শ্রী ১০৮ স্বামী রামদাস কাঠিয়াবাবা
অরণী মিত্র ২৮

শাস্ত্রকথা
হিতোপদেশ থেকে
শিবানী মিত্র ৩০

দ্বাদশ জ্যোতিঃর্লিঙ্গ
আশ্রমকন্যা ১৩

মহাপুরুষের কথা
'ভারতের দাতা ও গ্রহীতা'
শ্রী শ্রী তারাপীঠ ভৈরবদাস
জ্ঞানানন্দবাবা ৫

সত্যঘটনা — শম্ভুনাথ
শ্রীশ্রী জ্ঞানানন্দবাবার
শিবকল্পস্বরূপ অস্তিত্বকে চোখের সামনে
ফুটিয়ে তুলেছে প্রতিটি ছত্র
মৃণাল কান্তি সিংহরায় ১৫

কবিতা
বৃষ্টি ওগো
মধুমিতা বাগচী
পরমেশ্বর
চঞ্চল মজুমদার
১৮

বিশেষ প্রতিবেদন
কৃষ্ণাষ্টমী
সংযুক্তা বিশ্বাস ১৯

● বিতর্ক ৭ ● 'চিঠি- চাপাটি' ৩২ ● শব্দকল্প ২৭

সম্পাদকের বার্তা

অনেক আনন্দ নিয়ে বর্ষা এসে গেল । গরমের ক্লান্তি ঢেকে গেল তার সিক্ত ভালবাসায়। মাঠের পাড়ে , জানালার ধারে , চকচকে কালো পিচের রাস্তার উপর তার অবিশ্রান্ত রিমঝিম সুর বেজে চলেছে । কোথাও , কোথাও খানিকটা জল জমে ছোট্ট ডোবার সৃষ্টি হয়েছে, আবার কোথাও প্যাঁচপেঁচে কাদায় থপথপ করে পথ চলতে গিয়ে লুটোপুটি খাবার সম্ভাবনা । তবু আনন্দের কোনো কমতি নেই । বর্ষার জলে গা ভিজিয়ে আনন্দে মাথা নাড়ছে সবুজ গাছের দল । মাটির গন্ধে বাতাস গন্ধময় । পথের ধারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা রাধাচূড়া আর কৃষ্ণচূড়ার শরীর থেকে জলের দাপটে ঝড়ে পড়েছে ফুলের পাপড়ি , কালো পথের বুকটা হঠাৎ যেন রঙীণ হয়ে রয়েছে তার জন্য । সৃষ্টির ডাক নিয়ে এসেছে বৃষ্টি ! মিষ্টি একটা ভালবাসায় জগৎকে আচ্ছন্ন করতে । মেঘেদের গর্জণকে শান্ত করে তার কালো বুক চিরে ঝরে পড়েছে মাটির রুক্ষ শরীরে । তেমনি ঈশ্বরের নামও যে এমনই বৃষ্টি'র মত । অস্থির কামনার দাপাদাপিতে সর্বক্ষণ চঞ্চল হয়ে আছে যে হৃদয় , ঈশ্বরের নামের স্নিগ্ধ ধারায় শান্ত হয় সে অক্লেশে। জীবনের সত্যিকারের অর্থ সামনে আসে । বৃষ্টির আমোদে বসুন্ধরা এখন আমোদিত । বর্ষার ভেজা হাওয়ায় তার তপ্ত শরীর এখন শীতল হতে চায় ! ওগো বৃষ্টি, তুমি প্রকৃতির অহঙ্কার হয়ে ঝরে পড়ো মাটির বুকে , তুমি সৃষ্টিসুখের মাধুর্য্য নিয়ে এসে তপঃক্লান্ত ধরিত্রীর শরীরকে শান্ত করে দাও । তোমার স্পর্শে শান্তি ফিরবে আবার জগতে। শান্ত হবে তৃষ্ণার্ত্ত চাতকের দল । সৃষ্টির অলঙ্কার তুমি, তাই তুমি এত সুন্দর ।

ঃ আমাদের প্রকাশিত পুস্তক ঃ

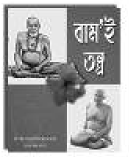

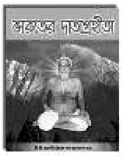

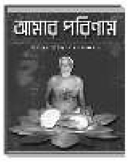

বিক্রয়কেন্দ্র ঃ
জ্ঞানবার্তা ফাউন্ডেশন
৩৮, সূর্য্য সেন স্ট্রীট, কোলকাতা-৯
ফোন ঃ ৯৮৩৬২৭১৯০৬
ওয়েবসাইট ঃ www.jnanbarta.com
ই-মেল ঃ jnanbarta@gmail.com
jnanaloke@gmail.com

জ্ঞান-আলোক , জ্ঞানবার্তা সাধনমার্গ , সাধকের জ্ঞানবার্তা

SUBSCRIPTION FORM

Mr. ☐ Mrs. ☐ Ms. ☐ Dr. ☐ Others (Please specify)

Subscriber Name :

Date of Birth : Gender ☐ M ☐ F

Flat No/House No. : Block No./Plot No.:

Apartment Name :

Street No. : Street Name :

Landmark : City: Pin Code:

Mobile No. : Landline No.: +91

E-mail ID :

I would like to subcribe to (please tick the relevant offer) : Starting Month :

Subscription Offer	Period Years			Cover Price			Total Cover Price			Lifetime Membership
				Gy-Al	Jnan-sadhan	Sadhaker	1Yr.	2Yr.	3Yr.	
☐ Gyan-Aloke	1	2	3	Rs. 380						
☐ Jnanbarta Sadhanmarg	1	2	3		Rs. 162					
☐ Gyan-Aloke + Jnanbarta Sadhanmarg	1	2	3	Rs. 380	Rs. 162					
☐ Sadhaker Jnanbarta	1	2	3			Rs. 260				
☐ Gyan-Aloke + Jnanbarta Sadhanmarg + Sadhaker Jnanbarta	1	2	3	Rs. 380	Rs. 162	Rs. 260	Rs. 802	Rs. 1604	Rs. 2406	Rs. 20,000

Normal postal charges are included . Courier Charges (If required) applicable extra. For Hand Delivery The Postal Charges will be deducted.

Cheque No.: Cheque Date Amount : Rs.

Bank Name : Bank Branch :

1. This offer is open to residents of Kolkata pincode and Howrah town only for other location DEMAND DRAFT/ONLINE PAYMENT will be accepted. For other parts of the country, you can drop cash to our A/C at BANK OF BARODA 00230100007119. 2. Cheques must be Account Payee only, in the name of JNANBARTA FOUNDATION payable at kolkata, only MICR cheques will be accepted. 3. Subscriber's signature on the subscription form should be identical to that on the cheque. 4. No cash payment will be accepted JNANBARTA FOUNDATION, will not bear any such kind of payment made to any person whatsoever. 5. Multiple subscription of the same publication or third party subscription will not be allowed. 6. Upon endorsement of your signature on the Subscription form you shall be deemed to be bound by the aforesaid terms and conditions. 8. Condition apply.

Subscriber's Signatue & Date

I have read and understood the Terms & Conditions mentioned

RECEIPT NO. :

Subscriber Receipt

Please retain this section for your records when you handover the filled in form along with the cheque

Received from ☐ Mr. ☐ Mrs. ☐ Ms. ☐ Dr. ☐ Others Name:

of :

Mobile No.: For : ____

Cheque No.: Cheque Date : Donation: ____

Bank Name : Bank Branch

Vendor Name : Mobile No.:

Agent's Signature : ____ Mobile No. : ____

JNANBARTA FOUNDATION : If You are not getting Magazine in time please contact us at 9836271906 With Receipt No.

ধারাবাহিক

আগের কথা ....

যেহেতু তুমি বেড়েই চলেছো - কমে যাচ্ছ না; এই বাড়া যে কোথায় শেষ হবে, আজ পর্যন্ত মানুষ তা জানতে পারেনি। তাহলই ক্রমবর্দ্ধমান হলে।

ভারতের দাতা ও গ্রহীতা

শ্রী শ্রী তারাপীঠ ভৈরবদাস
জ্ঞানানন্দবাবা

সমর - আর ঐশ্বরিক বলে যে বিজ্ঞান হয়, তার কি ব্যাপার বলুন তো দাদু!

জগদা - পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বহির্বিজ্ঞান, আর ভারতের বিজ্ঞান অধ্যাত্ম বিজ্ঞান। বহির্বিজ্ঞান এই পঞ্চ মহাভূত। যাকে মানি, জল, আগুন, হাওয়া, আকাশ বল তা থেকে উৎপন্ন; আর ভারতের বিজ্ঞান মন, অহংকার, চিত্ত, বুদ্ধি তার চেয়ে ঢের আগে হতে উৎপন্ন; তাই স্থূল পঞ্চমহাভূতের ক্রিয়া জ্ঞাত; মহাভূতগুলি

জন্ম কোথা হতে উৎপন্ন, তা ভারতীয় বিজ্ঞানবিদ্ জানে বলেই এগুলি হতে কোন শক্তি আহরণ করে স্থূল ক্রিয়া করাতে যায় না। বর্হিশক্তিকে বরং বৃদ্ধি করবার জন্যে যজ্ঞ করতেন।

সমর - পাশ্চাত্য বিজ্ঞান কি বহির্জগত হতে তৈরী করা?

জগদা - এই প্রত্যক্ষ জগৎ হতে সূক্ষ্ম পদার্থগুলি আহরণ করে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান দেখাচ্ছে। যেমন এই জগৎ হ'তে পরমাণু শক্তি সংগ্রহ করার পরই দৈব শক্তি আবার পরমাণু শক্তি এই জগতে পূর্ণ করে দিলে। পরে যে কোন স্থানে সেই পরমাণু শক্তির কেন্দ্রটি কাটিয়ে দিলে তা হ'তে পরমাণু শক্তি এই জগতের পরমাণু শক্তির সঙ্গে মিশে বেশী শক্তি হেতু জগতের ক্ষতি সাধন হয়। যেমন এক ঘটি জল টিউবওয়েল থেকে পাম্প করে নিয়ে আবার তাতে রাখতে পার কি? পাম্প করার সঙ্গে সঙ্গেই নীচের জল পরিপূর্ণ হওয়ায় আর তোমার ঘটির জল টিউবওয়েলে ধরবে না, পড়ে যাবে। তেমনি এ জগৎ হতে পরমাণু শক্তি আহরণ ক'রে এই জগতে ক্ষেপণ করলে পরমাণুশক্তি বেশী হেতু জগতের ক্ষতি হবে।

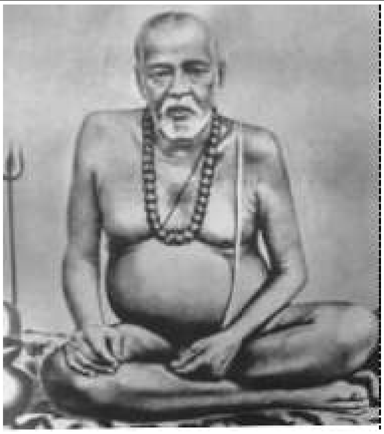

এক ঘটি জল টিউবওয়েল থেকে পাম্প করে নিয়ে আবার তাতে রাখতে পার কি? পাম্প করার সঙ্গে সঙ্গেই নীচের জল পরিপূর্ণ হওয়ায় আর তোমার ঘটির জল টিউবওয়েলে ধরবে না, পড়ে যাবে।

সমর - আপনার মত চোখ বুজে বসে একদিন পরীক্ষা করলাম, অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখা যায় না। আপনি চোখ বুজে কি দেখেন?

জগদা - তুমি ঘুমোবার মত চোখের পাতা ফেলেছিলে; ওতে অন্ধকার দেখা যায়, সেইজন্য ঘুম আসে। আর চিন্তাদ্বারা ধ্যেয় বস্তুর দিকে লক্ষ্য রেখে চোখের পাতা বুজলে অনেক কিছু দেখা যায়; যা শত চেষ্টাতেও বোঝানো যায় না। তুমি চোখের দৃষ্টিকে বড় বলে মনে কর বলে চোখ বুজে কিছুই দেখতে পাও না; যখন ওই দৃষ্টির প্রতি অবিশ্বাস আসবে , তখন চোখ বুজেই তুমি যা দেখবে চোখ চেয়ে আর দেখতে চাইবে না। চোখে দেখার বস্তুগুলি কোথায় কিভাবে উৎপন্ন হচ্ছে, রক্ষা হচ্ছে ও লয় হচ্ছে তার সম্পূর্ণ অবস্থা দেখা যায় বলে স্থূল বস্তুর জন্য দুঃখ হয় না। তাই তোমায় বলছিলাম, "অনেক দূর ঘুরে এলাম"। দেহ ছেড়ে অনেক দূর অল্প সময়ের মধ্যে ঘোরা যায় বুঝেছ?

সমর - আপনার সঙ্গে এতক্ষণ আলোচনা করে বুঝলাম, আরও সূক্ষ্ম জিনিস আছে, যা মনের দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়। তর্ক করলে অনেক করা যায়, কিন্তু বুঝলে কিছুই প্রতিবাদ করার থাকে না। বোঝাটাই তো মুশকিল! এই আপনি এত বললেন একটাও বেশ পরিস্কার করে বুঝতে পারলাম না, কেমন একটা মনে ছাপ লাগলো মাত্র।

(ক্রমশঃ)

 গতবারের সংখ্যায় কিছু লেখা বাদ পড়ে যাওয়ায় এ' মাসের বিষয়টিও 'আপন জন'

'নিজের দৃষ্টিভঙ্গিতেই আপন পরে'র প্রশ্নটা নিহিত থাকে । আমার কাছে আমার আপনজন কে সেটা শুধু আমার মন'ই জানে , আর কেউ সে কথা বলতে পারে না কখনই । কিন্তু মজার ব্যাপার হল এই আপনজনকেই খুঁজে বেড়ায় মন চিরদিন। সারাজীবন পাশে, পাশে থেকেও কেউ হয়ত আপনজন হয়ে উঠতে পারে না । কিছু কর্ত্তব্যের খাতিরে হয়ত সময়টা কেটে যায় একসাথে, কিন্তু আপনজন হয়ে ওঠা আর হয় না ! তবু আমরা আপনজন খুঁজে ফিরি সারাজীবন ধরে , আর কখনও কোনো নিভৃত একান্তে বসে মনে হয় , এ খোঁজাখুঁজির কোনো প্রয়োজনই নেই । তিনি যে রয়েছেন আমাদের মনের গভীরেই । যাঁর অস্তিত্ব আমাদের অনুভবকে ঐশ্বর্য্যশালী করে রাখে সর্বক্ষণ! তিনি ছাড়া এমন আপনজন আর কে'ই বা হতে পারে ! ক্ষণসুখের জীবনের ভঙ্গুরতায় আপনজনকে নইলে খুঁজবই বা কোথায় ! - অন্যের খবর জানিনা , আমার আপনজন একমাত্র তিনিই , যিনি স্মরণে, মননে সদাসর্বদা জড়িয়ে রয়েছেন আমার সঙ্গে ।

মনোময় ঘোষাল
বাগ বাজার

পরবর্তী সংখ্যার বিষয়বস্তু হল - "আদর্শ জীবন"

কথায় বলে কেউ কারো নয়, সেখানে 'আপন জন' কে ই বা হতে পারে? আপন মানে তো যে সম্পূর্ণ নিজের এবং সুখে-দুঃখে যে চিরকালই নিজের বলেই থাকবে। কিন্তু এই অনিত্য জগতে সম্পূর্ণ নিজের বলে কিছুই তো হয় না। আপাত দৃষ্টিতে আমরা মনে করি মা, বাবা, ভাই, বোন , স্বামী, পুত্র, কন্যা নিয়ে ভরা সংসারে এরাই তো আমার আপন জন, কিন্তু সত্যিই কি তাই! সময়ের সংঘর্ষে এদের অনেকেই তো হারিয়ে যায় অনেকভাবে, কারণ এই মায়ময় জগতে কালের নিয়মে এরা সকলেই তো অনিত্য। তাই আমি মনে করি, 'আপন জন' বলতে একমাত্র ঈশ্বরই তো আমার আপন, যিনি সুখে, দুঃখে, ইহলোক এবং পরলোক - সব সময়ই একান্ত আমার। কালের স্রোতেও যাকে হারানোর কোন ভয় কখনও নেই - তিনিই তো "আপন জন"- তিনিই তো ঈশ্বর।

মানালী দে
বিরাটি

পাঠকবর্গকে জানাই – এই বিভাগের লেখা পাঠানোর ঠিকানা – ৩৮, সূর্য্য সেন স্ট্রীট , ৩য় তলা , কলিকাতা – ৭০০০০৯। দয়া করে অন্য ঠিকানায় পাঠাবেন না ।

ফেসবুকে আমাদের একটি নতুন গ্রুপ শুরু করা হয়েছে 'সত্যের পথে' নামে। আমাদের এবারকার বিতর্ক-তথ্য সেখান থেকে নির্বাচিত হয়েছে । সকলকে অনুরোধ রইল আমাদের গ্রুপের সদস্য হবার জন্য। satter pothe

মন ভালো নেই

> শাস্ত্রে রয়েছে, ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল মন, মনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হল বুদ্ধি এবং বুদ্ধির চেয়েও শ্রেষ্ঠ হলেন আত্মা। যাঁর অস্তিত্বের কারণেই শরীর চলমান। যিনি পরমাত্মার অংশ আর মন হল সেই আত্মারই সবল রূপ।

শ্রীশ্রী জ্ঞানানন্দদাস উত্তরানন্দ

কেন উপনিষদে বলেছেন , ‘ ওঁ কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ ....’ - অর্থাৎ কার ইচ্ছায় মন আকৃষ্ট হয় ? - এ প্রশ্নের উত্তর কিন্তু মনের কাছেই রয়েছে অথচ সে উত্তর খুঁজতে হবে ত্যাগ ও তপস্যার মধ্য দিয়ে । শাস্ত্রে রয়েছে , ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল মন , মনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হল বুদ্ধি এবং বুদ্ধির চেয়েও শ্রেষ্ঠ হলেন আত্মা । যাঁর অস্তিত্বের কারণেই শরীর চলমান। যিনি পরমাত্মার অংশ আর মন হল সেই আত্মারই সবল রূপ ।

তবে কার ইচ্ছায় চলবে মন ? কার নির্দেশে সে নিজে পরিচালিত হয়ে দেহ সম্বলিত অপর ইন্দ্রিয়দেরও পরিচালনা করবে নিপুণভাবে? - ভগবৎ গীতায় রয়েছে, মন'কে প্রভাবিত করে বুদ্ধি এবং বুদ্ধি পরিচালিত হয়

আত্মশক্তির দ্বারা । কিন্তু আত্মা নির্বিকার, নিঃশঙ্ক, নিঃসংশয়, দেহজনিত কোনো ভাব'ই তার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না । তবে মন কখনও খারাপ হয় কি করে ? আর কখনও আবার ভালোই বা হয় কিভাবে ? ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তির কারণে কামনা পূরণের জন্য এক অদৃশ্য ছট্‌ফটানি এতটাই বিব্রত করে তোলে মনকে, অজ্ঞাতসারেই মন চঞ্চল হয়ে ওঠে, মন বলে ওঠে, ভালো লাগছে না এতটুকুও । আবার বিপরীত ভাবে কামনা পূরিত হলেই মন ভালো হয়ে যায় বেশ। নিজের বদনাম শুনলে মন খারাপ, আবার প্রশংসা শুনলেই মন ভালো !- আমাদের প্রবৃত্তি মনকে সর্বক্ষণ এভাবেই তাড়ণা করে বেড়ায় আর মন বিচলিত হয় তার উৎপাতে । উপনিষদে আবার বলেছেন, 'অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোহন্তরাত্মা দো জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।' - তিনি অঙ্গুষ্ঠ মাত্র ক্ষুদ্র হয়েও

অন্তরতম সত্ত্বারূপে সকলের হৃদয়ে বিরাজ করছেন। তিনিই আমাদের সকল জ্ঞানের উৎস, মনের বৃত্তিসমূহ এমনকি নিস্ক্রিয় মনও তিনি। 'মনোকৃতেন' অর্থাৎ মনে ইচ্ছা হলে তিনিই প্রাণরূপে শরীরে প্রবেশ করেন। মনের মধ্য দিয়েই তাঁর প্রকাশ পাওয়া যায় । কিন্তু তাঁর চৈতণ্যময় অস্তিত্বকে না জানবার দরুণই আমরা অবিদ্যার বস্তুতে মনকে নিবিষ্ট করে ভালো খারাপ খুঁজে বেড়াই । কিন্তু মন যদি ইন্দ্রিয়দের বশীভূত করে, নিবৃত্তিমার্গে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, তখন সেই উর্দ্ধগতি সম্পন্ন মন কামনা বাসনার উৎপাতে জর্জরিত হয় না । তাই তখন এই ভালো-খারাপের ভাবও আর খেলা করেনা তার মধ্যে । শুধুমাত্র অজ্ঞানতার কারণেই কামনার ওঠাপড়ার সঙ্গে মনকে জড়িয়ে আমরা 'মন ভালো নেই' কিংবা 'মন ভালো আছে'- এরূপ ভাবনায় অস্থির হই ।

মন খারাপ হলে, ব্যবহারের উপর তার প্রভাব পড়ে, সেজন্য তখন ব্যবহারও সঠিক থাকে না, এমনকি কর্মেও তার প্রভাব আসে। আবার দেখা যায় যে সৎ কর্মকারী যিনি, তাঁর মন কখনও খারাপ হয় না । দেখা যায় যেকোনো নিস্কাম কাজেই মন আনন্দলাভ করে, কোনো অহেতুক কামনার উৎপাত সেখানে না থাকায় সে কর্মের প্রতিফল তাকে আতঙ্কিত করে না। বিপরীতে অসৎ কর্ম যতই ধনলাভ করাক না কেন, সে কাজে মন কখনই ভালো হতে পারে না । সেক্ষেত্রে এক অযথা উৎকণ্ঠা মনকে ঘিরে থাকে সবসময় । তাই এ কথা নিশ্চিত, যেকোনো মনঃকষ্টের কারণটাই সকাম কর্ম । চাওয়া পাওয়ার থেকেই মন ব্যতিব্যস্ত হয় এইভাবে । কিন্তু সাধারণভাবে জীবনধারণ করে আমাদের খারাপ কিংবা ভালো এই দুই মনকে নিয়েই চলতে হয় ।

মন আত্মার সবল রূপ । অসীম শক্তিশালী সে । এমনকি দেহ সঞ্চালনও মনের দ্বারাই সম্ভব । তাই সেই মনের সঠিক প্রয়োগ না রইলে কর্ম বিনষ্ট হবে । এই শক্তিশালী মনকে পরিচালনা করে বুদ্ধি এবং সৎবুদ্ধির সহায়ক হল বিবেক । সেই বিবেকসম্পন্ন মন উর্দ্ধগতি সম্পন্ন হতে পারে প্রচেষ্টার দ্বারা । মন'কে নিয়েই আমাদের সূক্ষমার্গে ঘোরাফেরা , তাই মনকে সঠিক মার্গে যিনি বিচরণ করাতে পেরেছেন, অর্থাৎ মনের কর্তৃত্বে সকল ইন্দ্রিয়কে যিনি বশীভূত করতে পেরেছেন, তিনি অসাধ্য সাধন করতে পারেন । কারণ এই মনোরাজ্যের পরিধি এতই বিশাল , যে উর্দ্ধগতি সম্পন্ন মনের দ্বারাই আমাদের জীবত্বের শেষ হয়ে পূর্ণ মানবত্বে উপনীত হওয়া সম্ভব । মন'কে অধ্যাত্মবিজ্ঞান তাই এক বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন । এই মনের সাহায্যেই সর্ব নিয়ামক , অপরিচ্ছিন্ন আত্মার সঙ্গে পুনরায় যোগযুক্ত হওয়া যায় । স্থির মনের সাহায্যেই সাধনা ও তপস্যা করা চলে । এই মনের সহায়তাতেই আত্মজ্ঞান লাভ করে জীব প্রাজ্ঞ হয় । জাগতিক কিংবা মহাজাগতিক , আমাদের সর্ব কর্মের সহায়কই হল মন । ব্রহ্ম শুদ্ধ চৈতণ্য , তিনি নিরাকার ও নির্গুণ । মনের মাধ্যমেই তাঁর তেজ পরিবাহিত হয়ে জীবাত্মার দেহজনিত কর্ম'কে পরিচালিত করে ।

দেবী ভাগবতে বলা হয়েছে,

' এতদ্ধি জন্মসাফল্যং যদজ্ছানস্য নাশনম্
পুরুষার্থসমাপ্তিশ্চ জীবন্মুক্তদশাপি চ।
অজ্ঞাননাশনে শক্তা বিদ্যেব তু পটিয়সী।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন জ্ঞানং সম্পাদয়েন্নরঃ।'

- অজ্ঞানতা নাশই জীব জীবনের চরম পুরুষার্থ। জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত থেকে চিরতরে মুক্তিলাভ । এই অজ্ঞানতাকে বিনষ্ট করতে 'বিদ্যা' সহায়তা করে । সেজন্য, সকলের আগে বিদ্যার আশ্রয়ে

জ্ঞান'কে অবলম্বন করাই যথার্থ কর্ম । আত্মাই সকল জ্ঞানের উৎস এবং সেটি মনের ধর্ম । এই মন যদি জ্ঞানেন্দ্রিয় সংযুক্ত হয় তবে বিষয়বুদ্ধির আবির্ভাব হয় , আবার অন্যদিকে সেই বুদ্ধিই যদি সংস্কার ইত্যাদি যুক্ত হয়ে মনের মধ্যে বিরাজ করে, তবে সেই মন'ই একসময় যোগ প্রাপ্তি'র দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানলাভে সমর্থ হয়। এই মনের দ্বারাই সূক্ষ্মজ্ঞান জন্ম নিতে পারে । তাই মন একদিকে যেমন জীবকে বিষয় জ্ঞানে জর্জরিত করে, অন্যদিকে সেই অনিত্য বন্ধন ছিন্ন করেও তাকে মুক্তির আস্বাদ দেয় । সুতরাং বন্ধন কিংবা মুক্তি , এই দুইয়ের কারণই হল মন । শাস্ত্রে এ প্রসঙ্গে রয়েছে,

'মনস্তু সুখদুঃখনাং মহতাং কারণং দ্বিজ ।
জাতে তু নির্মলে যস্মিন্ ভবতি নির্মলম্ ।'

- জীবের সকল সুখদুঃখের কারণই মন । মন যদি নির্মল হয় , তবে সকল দুঃখ নিবৃত্তির কারণে সকল কিছুই নির্মল হয় । তাই মনকে অনিত্য

বিষয় থেকে প্রত্যাহার করে নিত্যবস্তুর মধ্যে প্রেরণ করাই উচিত এবং সেজন্য বহু উপায় বা পথের নির্দেশ শাস্ত্রে দেওয়া রয়েছে । তার মধ্যে যেমন মন্ত্রসাধনের পথ রয়েছে তন্ত্রে , তেমনি যোগশাস্ত্রে'র চতুর্বিধ যোগের মধ্যে মন্ত্রযোগের কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে । মন্ত্রজপ একটি উৎকৃষ্ট সাধনার পথ। 'মন্ত্রজপান্মনোলয়ো ইতি মন্ত্রযোগ।' - শ্রীগুরুদেব কর্তৃক প্রদত্ত বীজমন্ত্রে'র বা ঈশ্বরের নাম জপ করতে করতে মন যদি লয়প্রাপ্ত হয়, তাকেই মন্ত্রযোগ বলা হয় । এ প্রসঙ্গে মন্ত্রে'র ব্যাখ্যায় বলা যেতে পারে , মন্ত্র বলা হয় কারণ তা মননের থেকে ত্রাণ করতে সমর্থ । মনন, হল চিন্তারাশি, যা মনকে বিক্ষিপ্ত করে তোলে । মন যখন লয় প্রাপ্ত হয় তখন এই চিন্তা দ্বারা সে আর বিভ্রান্ত হতে পারে না । মন লয় হলেই চিন্তারাশি বিনষ্ট হয় ।সকল চিন্তা থেকে মন তখন মুক্ত হয়ে আত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হয় । আবার যেহেতু প্রাণস্পন্দন ব্যতীত মনের কোনো অস্তিত্ব নেই সেহেতু প্রাণ'ই মনের ত্রাণকর্তা । সেজন্য প্রাণায়ামে মন শান্ত হয় স্বাভাবিকভাবেই । এবং শ্রীগুরুদত্ত মন্ত্রজপ আর সেই সন্নিহিত দেবতার চিন্তার দ্বারা মনের একাগ্রতা লাভ হয় যার পরিণামই হল ' আত্মদর্শন' ।

'মনের ময়লা যত হিসাবমতো !
উড়াও তাকে মন্ত্রজপে ,
একসুরেতে বাধুক জীবন শুদ্ধ তারে -
দেহের ঘরে ।
আপনভাবে বারে, বারে,
মা, মা, ডাকে যে মন রত !
বিষয়বিষে জর্জরিত - এ বিশ্ব তখন
তারে কি আর ধরতে পারে !'

- এই মন'ই একদিকে যেমন বিষয়ভোগী জীবের বন্ধনের কারণ আবার নিবৃত্তি'র পথচারী হয়ে সেই মন'ই যোগযুক্ত হয় পরমাত্মার সঙ্গে । একই মনে ভোগ আর ত্যাগ যেন পাশাপাশি আসন পেতে বসে রয়েছে । সর্বক্ষণ এই অযূত টানাপোড়েণের মধ্যেই জীবন অতিক্রান্ত। বাসনা ব্যহত হলেই মন খারাপ , আর বাসনার সম্পূর্ণ নিবৃত্তিতেই মন নির্মল , শান্ত , আনন্দে'র স্বর্গে পরিণত । একই শরীরে উভয় মনোবৃত্তি'র দোলাচল চলছে সবসময়। এক অমোঘ শক্তির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দেহের ঘরে বাস করছে মন । আমার'ই মন, অথচ আমি তাকে চিনি না। তাই শ্রীগুরু প্রদত্ত মন্ত্রজপে'র দ্বারা মনের ময়লা অর্থাৎ অনিত্য কামনা বাসনার জঞ্জাল সরিয়ে ফেলে মনকে পরিশুদ্ধ করে তুলতে না পারলে মনের মাধূর্য্য বোঝা কঠিন ।

শাস্ত্র বলেছেন , এই বিপুল শক্তিসম্পন্ন মনের পাঁচটি ভুমি - বিক্ষিপ্ত, ক্ষিপ্ত, মূঢ়, একাগ্র এবং যোগ ।বিক্ষিপ্ত অর্থাৎ বিষয়ান্তরে বিচরণ -

এই মুহূর্ত্তে এক স্থানে তো পরমুহূর্ত্তেই অন্য কোথাও। যুধিষ্ঠির বলেছেন, জগতে সবচেয়ে দ্রুতগামী হল মন। সুতরাং সাধারণ ক্ষেত্রে সে মন যে সর্বদাই এমন গমনশীল হবে তাতে কোনো আশ্চর্য্যের কারণ নেই। এরপর আসে মূঢ়, অর্থাৎ বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে বিচরণের কারণে মনের মধ্যে অবসাদের সৃষ্টি হয় এবং সেজন্যে মন তখন বিশ্রাম চায়। সেই অবসন্ন স্তব্ধভাবকেই মূঢ় অবস্থা বলা হয়। নিদ্রা'র উৎপত্তি হয় এই মূঢ়ভাব থেকেই। এরপর বলা যাবে ক্ষিপ্ত অবস্থা'র ভাব।- ক্ষিপ্ত অর্থাৎ প্রচন্ড চঞ্চল হয়ে থাকে মন এবং এত দ্রুত সে তখন এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে ছুটে চলে যে সে সকল বিষয়ের মধ্যে কোনো পারস্পরিক সম্বন্ধ থাকে না। যেমন, এই মুহূর্ত্তে সমুদ্র ভাবল পরমুহূর্ত্তেই পাহাড় এবং তারপর উভয়ই মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল এবং এই ভাবকেই উন্মাদ অবস্থা বলা হয়। এই তিন প্রকার অবস্থায় যোগ সম্ভব নয়। কারণ এই প্রকার চঞ্চলতায় মন কখনও সেই পরম পুরুষার্থে লিপ্ত হতে পারবে না। তাই একাগ্র হতে হলে চিত্তের বৃত্তি নিরোধ প্রয়োজন। এই যোগ সাধনের জন্যই মনের স্ফুট অবস্থা অর্থাৎ একাগ্রতা আবশ্যক। মন'কে পরমাত্মামুখী করে তোলাই একাগ্রতা এবং সেজন্য ধ্যান, যাকে যোগশাস্ত্রে প্রত্যয়ৈকতানতা বা একরূপভাবনা বলা হয়।

একাগ্রতার ফলেই ধ্যান, ধ্যান গাঢ় হলেই ধারণা এবং ধারণার প্রগাঢ় রূপ'ই হল সমাধি। কিন্তু তারমধ্যেও ভাগ রয়েছে। সপ্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। মনের শেষভূমি'ই হল সম্পূর্ণ চিত্তবৃত্তি'র নিরোধ। এই নিরোধ'ই মনের পঞ্চম অবস্থা এবং যোগের শেষ ভূমি এবং সেই নিরোধের ফলেই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। সে অবস্থায় দেহমধ্যে আত্মার অস্তিত্ব থাকা স্বত্ত্বেও অহংজ্ঞান না থাকায় সে অবস্থা 'আছি কিন্তু নেই' অবস্থা। তন্ত্রে যে দশাটিকে অজ্ঞাতমন্ডল বলা হয়। যে দশায় মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার লুপ্ত হয়ে যায়। সেই অবস্থার পরই অখন্ড সত্ত্বায় অখন্ড জ্ঞান আসে, যা ব্রহ্মজ্ঞান।

মনের মাধ্যমেই আমরা সমস্ত জাগতিক ও মহাজাগতিক ঐশ্বর্য্য লাভ করতে সক্ষম। সকল ইন্দ্রিয়ের রাজা মন'কে তাই শ্রেষ্ঠত্বের তক্‌মা দিয়েছেন ভারতীয় অধ্যাত্ম শাস্ত্র। পূর্বেকার মুনিঋষিরা যে সাধনার পথ নির্দেশ করেছেন, স্মরণ, মনন, নিদিধ্যাসন - মনেরই অঙ্গ বিশেষ। মনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করাই সাধনা এবং তপস্যাও সেই মনকে কেন্দ্র করেই। আমরা সাধারণভাবে বুঝতে পারি না যে ঈশ্বর আমাদের মন নামক যে বিশাল ঐশ্বর্য্য প্রদান করেছেন, সেই মন'ই হল পুনরায় তাঁর সঙ্গে যোগযুক্ত হবার সোপান। তাই সামান্য চৈতন্যের আভাসও যে মনে রয়েছে, সেই মন কখনও খারাপ হতেই পারে না। ইহজগতের বাহ্য জৌলুসে ইন্দ্রিয় নিবিষ্ট হয় সহজেই, কিন্তু মন যদি তার আপন কর্তৃত্ববোধ হারিয়ে সেই ইন্দ্রিয়েরই পদানত হয়, তবে প্রবৃত্তির চাপে মন খারাপ হবেই। সেজন্য শম, দম, তিতিক্ষার পথ ধরে ইন্দ্রিয়কে সংযমায়িত করে মনকেই কর্তা করতে হবে। মনের কর্তৃত্বাধীনে ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি শান্ত হলে সেই অসীম শক্তিশালী মন উর্দ্ধগামী হতে পারবে অনায়াসেই। শুদ্ধ চিত্তে চিন্তারাশির বিক্ষিপ্ততা মনকে তাড়ণা করে না, তাই তখন আর সেই মন খারাপও হবে না। অকপট হৃদয় ও চিত্তের নির্মলতায় মন স্থির হতে পারে সহজেই তাই ঈশ্বরের স্মরণ, মনন মনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে একান্ত প্রয়োজনীয়।

দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ

আগের কথা......

কথিত আছে, কেদার দর্শনের নিমিত্ত নিষ্ক্রান্ত হয়ে পথেও যদি যে মৃত্যুবরণ করে, তবেও তিনি মোক্ষলাভ করেন। এ কথাও প্রসিদ্ধ আছে, কেদারেশ্বরের পূজা সমাপনান্তে সেখানকার উদক পান করলে জীবাত্মার দেহমুক্তি ঘটে।

আশ্রমকন্যা

ভীমশংকর

ষষ্ঠ জ্যোতির্লিঙ্গের স্থান সম্পর্কে বহু মত আছে। ভীমশংকরের স্থান মুম্বাইয়ের পূর্বদিকে ভীমা নদীর তীরে। এই জ্যোতির্লিঙ্গের উদ্গাম স্থান সহ্য পর্বতে। যেখানে জ্যোতির্লিঙ্গের পুরাতন মন্দিরটি অবস্থিত। শিবপুরাণের এক স্থানের বর্ণনায় মনে হয় ভীমশংকর জ্যোতির্লিঙ্গ আসামের কামরূপ জেলার গৌহাটিতে ব্রহ্মপুর পাহাড়ে স্থিত। আবার কেউ মনে করেন, নৈনিতাল জেলায় উজ্জনকের বিশাল শিবক্ষেত্রেই ভীমশংকরের স্থান নির্দেশিত।

কুম্ভকর্ণের ঔরসে কর্কট রাক্ষসের কন্যা

কর্কটির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ভীম নামে এক মহা পরাক্রমশালী রাক্ষস। ঈশ্বর বিশ্বাসী এবং বিষ্ণুভক্তদের উপর যাঁর যারপরনাই রাগ ছিল। সহস্রাধিক বৎসর প্রজাপতি ব্রহ্মার তপস্যা করে ভীম তাঁকে সন্তুষ্ট করেছিলেন এবং ব্রহ্মার বরে বলীয়ান হয়ে তিনি স্বর্গ থেকে দেবতাদের বিতাড়িত করলেন। এমন কি বিষ্ণুও তার সেই পরাক্রমের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারলেন না। ভীম এরপর ভূলোক জয় করাবার জন্য তৎপর হলেন। প্রথমেই ভীম কামরূপ দেশের রাজা সুদক্ষিণকে পরাস্ত করে বন্দী করলেন।

রাজা সুদক্ষিণ ছিলেন অত্যন্ত শিবভক্ত। তিনি বন্দী অবস্থাতে সব কিছু চ্যুত হয়েও সর্বদা শিবের ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। এমনি করেই দিন অতিবাহিত হতে লাগল। এদিকে রাক্ষস ভীমের দৌরাত্ম্যে অস্থির হয়ে দেবতারা তখন রাক্ষস ভীমের বিনাশ কামনা করলেন। শিব তাঁদের কথা দিলেন যে ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু তিনি, ভক্তের রক্ষার্থে অবশ্যই উদিত হবেন। অতঃপর রাজা সুদক্ষিণ যখন ভগবান শিবের গভীর উপাসনায় মগ্ন। ভীম তাঁকে তখন সংহার করতে উদ্যত হলেন এবং শ্রী ভগবান শিবের পার্থিব লিঙ্গ মূর্তির উপরই তরবারি দিয়ে আঘাত করতে উদ্যত হলেন। স্বয়ং মহাদেব তখন সেখানে প্রকটিত হয়ে তাকে বাধা দিলেন এবং বেশ কিছুকাল যুদ্ধ চলবার পর, দেবতাদের অনুরোধে অহংকারী ভীমসহ অন্য অসুরদের তিনি শুধুমাত্র হুঙ্কারেই ভস্ম করলেন। তখন জগৎ শান্ত হল এবং মুনিগণের বিশেষ প্রার্থনায় তিনি ভীমশংকর জ্যোতির্লিঙ্গরূপে প্রকটিত হলেন।

কথিত আছে, এঁর পূজা করলে সর্ববিপদমুক্ত হওয়া যায় এবং সকল মনোস্কামনা পূর্ণ হয়। ভীমশংকরের উপলিঙ্গ ভীমেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ এটি সহ্য পর্বতেই অবস্থিত। ভীমেশ্বর মহা বল প্রদানকারী ও পাপ সংহারক।

চলবে

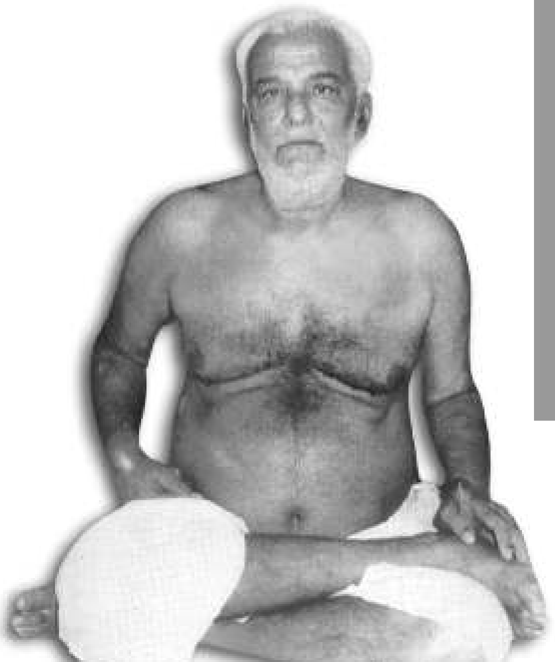

বড় গল্প

সত্য ঘটনা অবলম্বনে

শম্ভুনাথ

আগের কথা......

এখান হ'তে সুকান্তবাবুর নির্দেশিত কাঁচা পথে হাঁটতে শুরু করলেন তাঁরা। বন্ধুর পথ, প্রখর সূর্য্যের তাপ উপেক্ষা করে একসময় এসে পৌঁছালেন তেলিখানা মহাশ্মশানে।

মৃণাল কান্তি সিংহরায়

সারি সারি তরুরাশি পরস্পরকে নিবিড় স্নেহের আলিঙ্গনে ধরে রেখেছে। চারিদিকে সবুজের সমারোহ। তাপিত মানুষের প্রাণ জুড়োবার জন্য সর্বত্রই যেন শীতল স্পর্শের অনুভব। এ যেন এক অন্য ভুবন। নিঃস্তব্ধ পরিবেশ, নিজেকে জানার, নিজেকে চেনার দর্পন। ধীর পায়ে তিনজনে এগিয়ে গেলেন আশ্রমের অভ্যন্তরে। সম্মুখে দেখলেন করুণাময় তালপাতার চেটাইয়ে বসে আছেন বকুল তলায়। আশেপাশে কেউ নেই, সত্যবাবু কাছে যেতেই তিনি বললেন, ''তারাপীঠ ঘুরেও সাধ মেটেনি, আবার এখানে?'' - অপরূপা দেবী কান্নায় লুটিয়ে পড়লেন তাঁর শ্রীচরণে। 'আমার বড় বিপদ বাবা, আমার মেয়েকে আপনি বাঁচান, আপনি

না দেখলে কে দেখবে বাবা? তাই বড় আশা নিয়ে এখানে ছুটে এসেছি।' কথাগুলি বলে আরো জোরে কাঁদতে থাকেন তিনি। করুণাময় গম্ভীরভাবে বসে থাকলেন কিছুক্ষণ, তারপর সবিতাকে ডেকে কাছে বসালেন। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, "তোর সুন্দর মুখটা এত মলিন কেন মা? কি দুঃখ তোর? শরীরে কী কষ্ট?" সবিতা কোন কথা না বলে তাঁর দিকে চেয়ে থাকে। তিনি বলতে থাকেন, "মনকে শক্ত করে - নিজের আয়ত্তের মধ্যে রাখতে হয়। যারা তা পারে, তাদের কোন সমস্যা হয় না। সবসময় দুঃখ-সুখ সমানভাবে ভোগ করার জন্য তৈরী থাকতে হয়। আর সবকিছুই কর্মফলের নিরিখে বিধি নির্দিষ্ট। তাতে ভেঙে পড়লে লড়বে কি করে? মানুষের শক্তি দেবতার চেয়ে কম কিছু নয়, তবে যদি সে নিজেকে সংযম, নিষ্ঠা ও অধ্যাবসায়ের মধ্যে গড়ে তোলে। কারণ মানুষই প্রমাণ করে তাঁর অস্তিত্বের। আর হীনমন্যতায় নিজেকে মুড়ে রাখলে উন্মুক্ত বিশাল পৃথিবী হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্ব-সৃষ্ট জীবনের কানাগলিতে আবদ্ধ থাকবে। কেবল আসা যাওয়াই হ'ল, কাজের কাজ কিছুই হ'ল না। মরুভূমির উটের মত ভ্রান্তির বালিতে মুখ না গুঁজে মাথা উঁচু করে আত্মবলে বলীয়ান হয়ে, চোখ, কান খোলা রেখে - সত্যের পথে অগ্রসর হ'লে কোন বাধাই থাকবে না। লক্ষ্যপথে তারামা'র কৃপায় ঠিক পৌঁছে যাবে।" অপরূপা দেবীরা মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁর শ্রীমুখ নিঃসৃত অমৃতবাণী শ্রবণ করে নিজেদের ধন্য মনে করছেন। তাঁদের ঘোর তখনও কাটেনি। করুণাময় সবিতাকে বললেন, "ভয় পাবি না, আনন্দের সঙ্গে সংসারের সব কাজকর্ম্ম করে যাবি। আর বাড়ীতে একটা শ্বেত

শিবলিঙ্গ রেখে প্রত্যহ তাঁকে শ্রদ্ধাভরে ফুল-জল দিবি। ” সত্যবাবু তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আমরাও কি তাঁর পূজা করতে পারি বাবা?’ ‘‘মন চাইলে অবশ্যই করতে পারেন। তবে শুদ্ধাচারে তা করতে হবে। যখন যে কাজ করতে হবে - সেই ভাব ধারণ করতে হয়। না হলে অসি ধরে বাঁশি ফুঁকলে অনিষ্টই হবে। কোন কর্মই পূর্ণতা পাবে না। ” কথাগুলি বসে সবিতাকে করুণাময় শিবপূজা করার পদ্ধতি সম্পর্কে দু-একটি উপদেশ দিলেন। আশ্রমের ভিতর হ’তে এক ভদ্রলোক তাঁকে জানালেন, তাঁর সেবার ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। একথা শুনে করুণাময় উঠে দাঁড়ালেন। সত্যবাবুরা সকলে তাঁকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম জানালেন। তিনি ধীর পায়ে ভোগের ঘরে (রান্নাঘরের দিকে) ধীর পায়ে অগ্রসর হ’লেন।

সত্যবাবুরা ফিরে এসেন গৃহে। কিন্তু চোখে মুখে বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি। পরের দিন সকালে সত্যবাবু ছুটলেন কলকাতায়। অনেক ঘোরাঘুরির পর একটি শ্বেত শিবলিঙ্গ পেলেন তবে দোকানের মালিক তা বিক্রয় করতে অসম্মত হ’লেন। কারণ কিছুদিন পূর্বে এক ভদ্রলোক তার অর্ডার দিয়েছিলেন কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে ভদ্রলোক তা নিতে আসেননি। সেজন্যে তা দেওয়া যাবে না জানালেন। কিন্ত সত্যবাবু তাঁকে অনেক অনুনয় বিনয় করে অবশেষে তাঁকে রাজি করিয়ে শিবলিঙ্গটি কিনলেন এবং অতি সযত্নে গৃহে আনলেন। সেদিন ছিল রটন্তি চতুর্দ্দশী, ঠাকুরঘরের একটি বেদীতে শিবলিঙ্গটি বসালেন।

চলবে

কবিতা

বৃষ্টি ওগো

মধুমিতা বাগচী

বৃষ্টি এল দিঘির পারে
উড়িয়ে হাওয়ার ভেলা
বৃষ্টি এল, দূর আকাশে
কালো মেঘের খেলা !
স্বপ্নসম আবছা এখন
পুকুর নদীর পাড় ,
বৃষ্টিজলে সিক্ত হল
রুদ্ধ মনের দ্বার !
ওগো বৃষ্টি , তুমি
স্নিগ্ধপ্রেমের বিন্দু ছড়াও
সারা জগৎ জুড়ে —
বৃষ্টি তুমি ক্ষিপ্ত হৃদয় ,
ভরাও তোমার সুরে !
বৃষ্টি তুমি এই প্রকৃতির
সৃষ্টিসুখের হাসি !
বৃষ্টি তোমার ঝরে পড়া
দেখতে ভালবাসি ।

পরমেশ্বর

চঞ্চল মজুমদার

সৃষ্টি তোমার, পালন তোমার
প্রলয় তোমার দৃষ্টিতে,
দেবাদিদেব জগৎ ভরুক
তোমার কৃপাবৃষ্টিতে ।
তুমি নাদ, বিন্দু তুমি'ই
বিশ্বজুড়ে তোমার ঘর -
শ্রেষ্ঠ তুমি , ত্রাতা তুমি
হে দেবদেব পরমেশ্বর !

এবার মোবাইল অ্যাপস্ এবং ইন্টারনেটেও আমাদের বই পড়বার সুযোগ রইল -

বিশেষ প্রতিবেদন

কৃষ্ণাষ্টমী

পিতার কোলে চড়ে ভগবান পৌঁছালেন গোকূলে লীলা যশোদা ও নন্দঘোষের গৃহে। ভগবানের নিত্যসঙ্গিনী যোগমায়ার মায়ার চাদরে ঢাকা পড়ে রইল বিশ্ব। জগৎকে মায়ানিদ্রায় মগ্ন রেখে আবির্ভূত হলেন ভগবান।

সংযুক্তা বিশ্বাস

বাতাসের বেগ কমছে না কিছুতেই, বন্ধ হয়নি বর্ষার ঘনঘটা। অবিশ্রান্ত মেঘের ঘর্ষণে বিদ্যুতের অহংকার ঘন, ঘন ছড়িয়ে পড়ছিল আকাশজুড়ে। অন্ধকার রাত্রির আচ্ছন্নতায় সকল মনই নিদ্রালুপ্ত হয়ে পড়ছে ধীরে, ধীরে। সেদিন কিন্তু প্রকৃতির এমন অস্থিরতার কারণটা বুঝতে পারেনি জগৎ। ধীরে, ধীরে তাই সুপ্তির গভীরে ডুব দিয়েছিল নিজস্ব কুটিরের আড়ালে। এমনকি কারাগারের অন্ধকারময় পরিবেশেও দ্বাররক্ষকরা সেই বিশিষ্ট রাত্রিতে কি এক অবসন্নতায় হয়ত নিজেদের অনিচ্ছাবশতঃই গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়েছিল সহসা। যোগমায়ার মায়ার জাল বিস্তীর্ণ হয়েছিল জগৎজুড়ে। কিন্তু নগর ও রাজপ্রাসাদের সমস্ত প্রাণীই সুপ্তি'র গভীরে

অবগাহন করলেও জেগে ছিলেন শুধু দুইটি প্রাণ , বসুদেব ও দেবকী । কংসের ভগিনী ও জামাতা , পূর্বেকার পৃশ্নি দম্পতি ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অবতার স্বরূপ তাঁদের অষ্টম সন্তানের প্রতীক্ষায় তন্ময় হয়ে অপেক্ষারত ছিলেন কারাগারের এক কোনে । যে ভগবানকে কোলে তুলবার প্রতীক্ষায় জন্ম কাটিয়েছিলেন তাঁরা , সেই ভগবানই এই জন্মে ধন্য করলেন তাঁদের। জন্ম নিলেন ভাগ্যবান দম্পতির কোলজুড়ে । তমিস্রার ঘন অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছিল জগতের সকল বস্তু। মায়ার আবহে অন্ধকার যেন তার ভালবাসায় ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল জগৎকে । জগৎকে ত্রাণ করতে, নররূপে জন্ম নিলেন ভগবান মাটির বুকে। শ্রী ভগবান জন্ম নিলেন কংসের কারাকক্ষে , মায়াপ্রকৃতির কোলে শুধুমাত্র পঞ্চভূতাত্ত্বিক দেহে কর্ম করবার প্রয়োজনে । নারায়ণের পূর্ণাবতার তিনি । এ জগতের পালক তিনিই ! তবে কি প্রয়োজন তাঁর জীবের ছদ্মবেশ ধারণের ? এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন গীতায় ,

'যদা যদা হি ধর্ম্যস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থান্যমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুস্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।

(৭/৮-গীতা)

- অর্থাৎ অধর্মকে বিনাশ করতে এবং ধর্মের প্রতিষ্ঠার কারণে তিনি বারবার জগতে আসতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ । তবু যখন তিনি এসেছিলেন দেবকীর কোল জুড়ে , শিশুটির রূপ দেখেই মন ভরেছিল তাঁর । সেদিন সেই রাত্রিতে আকাশ জুড়ে কৃষ্ণকালো মেঘের সারি রাত্রির অন্ধকারকে বিচিত্রতর করে তুলেছিল। তুমুল বৃষ্টির অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণের মাঝে বিদ্যুৎপাত

প্রকৃতির অধৈর্য্য উৎকণ্ঠা বাড়িয়ে তুলেছিল ক্রমাগত। বৃষ্টির একটা অসীম মাদকতা আছে, যা সকলকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে ভালবাসে। আর সেই ঘুমের গভীরে মায়াময় স্বপ্নে তলিয়ে যেতে যেতে তারা ভুলে যায় স্মৃতি, সত্ত্বা, ভবিষ্যৎ। এমনই মায়ার আঁচলে জগতকে বেঁধে, নিদ্রাতে আচ্ছন্ন জীবকূলকে উদ্ধার করতে নররূপধারী নারায়ণ অবতীর্ণ হলেন প্রকৃতির কোলে । দেবকী ও বাসুদেবের বহু জন্মের সাধনার আরাধ্য ধন পালনকর্তা শ্রীহরি, মা দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান হয়ে অধর্মকে বিনাশ করবার কারণে নররূপ ধারণ করেছিলেন। বন্ধনমুক্ত পুরুষ জন্মেই তাঁর ছড়িয়ে রাখা মায়া'র মোহরূপ আবর্তের কারাগার থেকে মুক্ত করলেন নিজেকে। পিতা বসুদেব শৃঙ্খলমুক্ত হলেন অলৌকিক উপায়ে। অশান্ত যমুনা শান্ত হয়ে পথ করে দিল তাঁকে, শিশু কৃষ্ণকে মাথায় ছাতা

ধরলেন নাগরাজ বাসুকি । পিতার কোলে চড়ে ভগবান পৌঁছালেন গোকূলে লীলা যশোদা ও নন্দঘোষের গৃহে। ভগবানের নিত্যসঙ্গিনী যোগমায়ার মায়ার চাদরে ঢাকা পড়ে রইল বিশ্ব । জগৎকে মায়ানিদ্রায় মগ্ন রেখে আবির্ভূত হলেন ভগবান। ঈশ্বর যে মায়াতীত। সকল আবেগের উর্দ্ধে তাঁর একাকী অবস্থান। তাঁর মায়াময় জগতের স্রষ্ঠাও তিনি। মুক্তিও তিনি পালনও তিনি। তাঁর ইচ্ছায় জগৎ আবর্তিত। সৃষ্টি তাঁরই ইচ্ছাধীন। পুরুষ থেকে বহু পুরুষ হয়ে তাঁর মায়াময় জগতে নিজেকে ছড়িয়ে দেওয়া। মায়ার জালে আচ্ছন্ন জীবকূলের সাধ্য কি সেই স্রষ্ঠা'র পাতা বর্ণময় সৃষ্টির বাইরে, নতুন সৃষ্টি করবে! তাই তাঁর ইচ্ছাধীন হয়ে জগৎ আচ্ছন্ন রইল। জন্মাষ্টমীর রাত্রির উত্তাল প্রকৃতি শুধু একাকী তার সমস্ত আবেগ নিয়ে কোল বাড়িয়ে আহ্বান জানালো শ্রী ভগবানকে। এই পবিত্র জন্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিজেকে ধন্য করল সে। অক্ষয় হয়ে ইতিহাস রচনা করল এই ক্ষণ। কৃষ্ণ মায়ার জগতে প্রবেশ করলেন, নতুন লীলা প্রদর্শনে জগতকে ধন্য করবার বাসনায়। অধর্মের নাশ ও ধর্মের প্রতিষ্ঠা। সাধুজনের সুরক্ষা কবচ তিনি। সর্বজীবের পালনকর্তা।

নন্দঘোষের ঘর আলো করা দেবশিশুকে দর্শন করে ধন্য হল গোকূল। মর্ত্যের মানবশিশুর অঙ্গে এত রূপ। দৃষ্টি ফেরাতে পারে না কেউই। মাতৃস্নেহ উথলে পড়ে যশোদার। কত সাবধানে কোলের শিশুকে সযত্নে লালনপালন করেন তিনি। মাতৃদুগ্ধে পুষ্ট হয়ে বেড়ে ওঠে ধীরে ধীরে নন্দলাল। কিন্তু বিধি যে বাম। টের পেয়েছেন কংসরাজ। পুতনাকে

মাধ্যম করে কৃষ্ণাষ্টমীতে জন্ম নেওয়া সকল শিশুকেই বধ করতে উদ্যত তিনি। দুগ্ধপোষ্য শিশুগুলিকে বিষভরা স্তন্যদান করে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়ে মহারাজ কংসকে খুশি করতে লাগল পুতনা। কান্নার রোল উঠল দিকে দিকে। অনেক শিশুর মতো আক্রোশ বশে কৃষ্ণকেও কোলে নিলেন পুতনা স্তন্যদান করবার বাসনায়।

কৃষ্ণ শব্দের অর্থ হল আকর্ষণ করা- অর্থাৎ যিনি সকলকে আকর্ষণ করেন, যিনি জীবের আত্মাস্বরূপ, যিনি অনন্ত শক্তির উৎস। জগৎ প্রতিপালক। যিনি অনন্ত জ্ঞানের উৎস-জগৎ সঞ্চালক শ্রীহরি। (কথিত আছে, ভক্তজন পাপাদি দোষাকর্ষনাৎ কৃষ্ণ)। পরমাত্মা হয়ে যিনি আকর্ষণ করেন জীবাত্মাকে সেই অপরিচ্ছিন্ন সত্ত্বার সঙ্গে পুনঃমিলনের তাগিদে । পুতনার স্তন্যপান করতে, করতে এমন আকর্ষণ করলেন তিনি, পুতনা'র ওখানেই ভবলীলা সাঙ্গ হল। ঈশ্বরের হাতে মৃত্যু! অখন্ড স্বর্গবাস।

দেবতার পায়ে ঠাঁই মিলল পুতনার। কংস কিন্তু শান্ত হলেন না। আরও বেশী উন্মত্ততা বেড়ে গেল তার। শান্ত প্রকৃতির কোলে বেড়ে উঠতে লাগলেন শ্রীনারায়ণ। ননীচোরা বদনাম জুটল তাঁর গোয়ালিনীদের ঘরের ঘি, মাখন চুরি করে খাবার জন্য। দুষ্টু ছেলেকে কি করে শান্ত করবেন ভেবে কূল পেলেন না মা যশোদা। সারাদিন কাদামাটি লেগে শরীর নোংরা হয়েছে ভেবে ছেলেকে পরিষ্কার করতে গেলেন তিনি। কোলের সন্তান হাঁ করে মুখের ভিতর বিশ্বদর্শন করালো তাঁকে। ঈশ্বরের অনুগ্রহ বুঝতে জগতের সময় লাগে না হয়ত বা কিন্তু মাতৃত্বের কাছে জগৎ তুচ্ছ। তাই শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর প্রাণের দুলাল ভেবেই চিরকাল পরিচর্যা করে এসেছেন যশোদা। যতই তিনি জগৎ প্রতিপালক হোন, মানুষী মা'য়ের স্নেহের কাছে শিশু গোপাল হয়েই ধরা দিয়েছেন তিনি সর্বদা।

যমুনার নিকটবর্তী কালিন্দী হ্রদে কালীয় নাগ বাস করতেন। অনন্তনাগের আদেশে প্রতি বৎসর কার্তিক পূর্ণিমায় সকল নাগগণ গড়ুরের পূজা করতেন। কিন্তু একবার কালীয় নাগ নিজের অহংকারবশত পূজা তো করলেনই না পরন্তু অন্যের পূজার উপকরণ ভক্ষণ করতে চেষ্টা করলেন। অন্যের কোনো নিষেধ কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করেই। এই উপলক্ষ্যে গড়ুরের সঙ্গে কালীয়'র ভীষণ যুদ্ধ হল। যুদ্ধে পরাজিত কালীয় তখন এই হ্রদে আশ্রয় নেন। সৌভরীর অভিশাপের কারণে একমাত্র এই স্থানে গড়ুর আসতে পারতেন না। এক সময় শ্রীকৃষ্ণ গোকূলের অন্য রাখাল বালকদের সঙ্গে এই স্থানে গোচারণ ও খেলা করছিলেন। তাঁর গোরুগুলি তখন তৃষ্ণা মেটাতে ওই হ্রদের জল পান করে মৃত হলে শ্রীভগবান তাদেরকে জীবিত করে, হ্রদমধ্যস্থ সর্পভবনে প্রবেশ

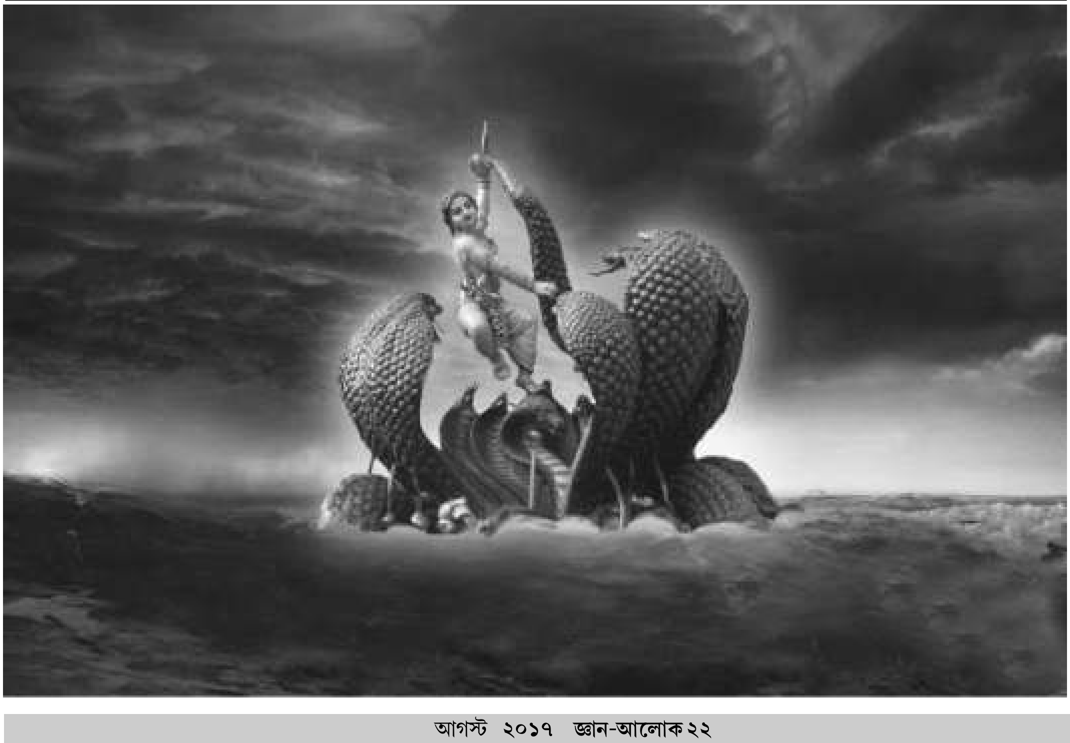

করলেন একাকী। কালীয় তাঁকে সাধারণ মানুষ ভেবে গ্রাস করা মাত্র তার কণ্ঠ ও উদর দগ্ধ হয়ে রক্ত বমি শুরু হয়ে গেল। তখন কালীয়'র স্ত্রী সুবলার কাতর প্রার্থনায় শ্রীকৃষ্ণ তাকে পুনরায় জীবন ফিরিয়ে দিলেন ও ওই স্থান ত্যাগ করবার নির্দেশ দিলেন। কালীয় তখন ওই হ্রদ ত্যাগ করে রমণক দ্বীপে পালিয়ে গেলেন। শ্রীভগবানের কৃপায় কালিন্দী হ্রদ আবার পুনরায় আগের মত পবিত্র ও সুন্দর হয়ে উঠল। বালক শ্রীকৃষ্ণের বাঁশির সুরে আকর্ষিত হত জীবকূল। বাঁশির সুর যেন বলে দিত-হে মর্ত্যের জীবকূল তোমরা সকলেই আমা হতে উদ্ভুত। আমার এক ইচ্ছায় তোমাদের এক থেকে বহুতে ছড়িয়ে দিয়েছে। তোমরা হিংসা, দ্বেষ, হানহানি ভুলে এক হও-আমার সঙ্গে যোগযুক্ত হও। পরমাত্মার একান্ত মিলন কামনায় সদা উন্মুখ জীবাত্মার অন্তর স্থির হও- যে পরমাত্মার অংশ তোমরা,

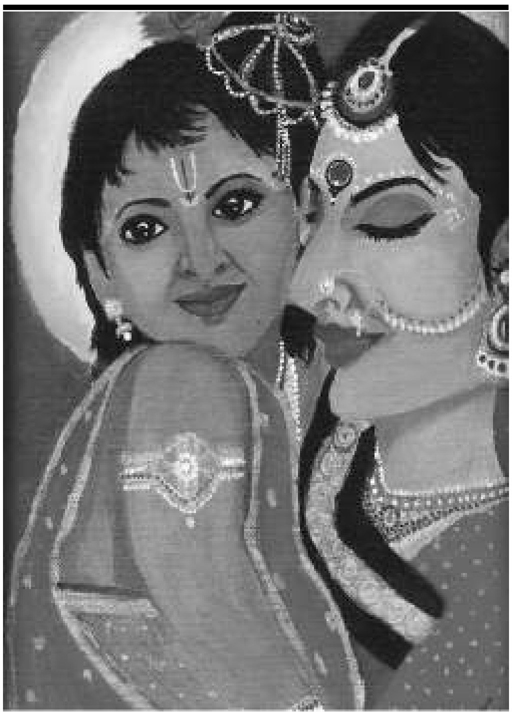

সেই বিশালের সঙ্গে পূর্ণবার মিলিত হবার চেষ্টায় সমভাবে কর্মে ব্রতী হও!

আজও শ্রী ভগবান তাঁর বাঁশরী হাতে তাঁর ঐশ্বরিক প্রেমের দীপ্তি ছড়িয়ে যান প্রতিটি অন্তরে। জন্মাষ্টমী তাই আমাদের এক পবিত্র স্মরণ তিথি। যে তিথির পবিত্র ঐশ্বরিক বার্তা সর্বভূতে তাঁর অস্তিত্বকে স্মরণ করায়। ঘরে, ঘরে প্রতিটি নবীন শিশুর উচ্ছ্বাসেই তিনি আছেন। প্রতিটি প্রাণে তাঁরই সর্বময় অধিষ্ঠান আমরা যে প্রজারূপে তাঁরই অংশ। প্রকৃতির কোণায় কোণায়-আকাশে, বাতাসে, ধরিত্রীর প্রতিক্ষায় তাঁর ভালবাসা ছড়িয়ে আছে। গীতায় শ্রীভগবান নিজের মুখে বলেছেন, - (৪/৬-গীতা)

'অজোহপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামাধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।।'

- অর্থাৎ আমি জন্মরহিত। অবিনাশীস্বরূপ এবং সর্বভূতের ঈশ্বর হওয়া সত্ত্বেও নিজ প্রকৃতিকে অধীন করে স্বীয় যোগমায়া দ্বারা প্রকটিত হই। মানুষের মৃত্যু হবে, নতুন মানুষ জন্ম নেবে আবার কিন্তু শ্রীহরির চরণস্পর্শে চিরঞ্জীব জন্মাষ্টমীর পবিত্র তিথিকে যুগে যুগে, কালে, কালে মানুষ সদাই স্মরণে রাখবে।

সূত্রঃ ব্রহ্মবৈবর্ত-কৃষ্ণ-১৯, ২০। গর্গ-বৃন্দা-১২। ভগবত ১০স্ক-৬।

MAGZTER
DIGITAL NEWSSTAND
TAP • READ • ENJOY

এবার মোবাইল অ্যাপস্ এবং ইন্টারনেটেও আমাদের বই পড়বার সুযোগ রইল -

ভগবানের লীলাখেলা

শ্রী বামাবতার

শিবানন্দ

ভগবান বামদেবের প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ্য

ধারাবাহিক

পূর্ব প্রকাশিত'র পর

আগের কথা ....

কখনও জয় তারা, কখনও জয় দুর্গা বা জয় কালী নামে গলা মেলাতেন আবার কখনও হরিসংকীর্ত্তণে মিশে গিয়েও হরি, হরি বলে গেয়ে উঠতেন। সেই নাম করবার সময় তাঁর দুই নয়ন বেয়ে অবিরল প্রেমের ধারা নেমে এসে তাঁর মুখমন্ডল আরো জ্যোতির্ময় করে তুলত।

শাস্ত্রে বলেছেন , যে ভোগ ব্যতীত কখনও কর্মসকলের বিনাশ সম্ভব নয় । কারণ কর্মভাবেই আমাদের শরীর উৎপন্ন হয়ে থাকে । এই শরীর পঞ্চ মহাভূতের দ্বারা নির্মিত হয় , তার মধ্যে পরমাত্মার অধিষ্ঠান থাকে বলে দেহ নাশ হলেও তাদের কোনো বিনাশ নেই । মানুষ পূর্বকর্মের প্রভাবে কর্ম করে থাকেন , যেকোনো কর্মের অনুষ্ঠানে তার ফলও উৎপন্ন হয় । আত্মা সেই কর্ম ও মহাভূত সকলের সঙ্গে লিপ্ত হয়ে সুখদুঃখ ভোগ করেন । আত্মার কোনো বিনাশ হয় না এবং আত্মা কখনও পঞ্চ মহাভূতকে পরিত্যাগ করেন না । মানুষের কর্মক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত তাকে পুনঃ পুনঃ একই রূপ অবলম্বন করে থাকতে হয় । এই ভোগায়তন নিয়েই যোগাবলম্বনকারী মানুষ শিবত্বে পৌঁছাতে

সক্ষম। প্রাণের অবস্থিতিতে পরিপূর্ণ হয়ে আছে ব্রহ্মান্ড অর্থাৎ দৃশ্যমান ও অদৃশ্য জগৎ। অথচ ইন্দ্রিয়দৃষ্টিকেই সবচেয়ে প্রাধান্য দান করে ভ্রান্তির স্বর্গে বাস করছি আমরা। অনুভবের জগৎ সেজন্য বহুদূরেই থেকে যাচ্ছে। প্রাণ আত্মার প্রতিচ্ছায়া, যাকে লাভ করে পঞ্চভূতের সংসার নিয়ে, অর্থাৎ দেহধারণ করে জগতে আসবার অধিকার পেয়েও অহেতুক বিষমিশ্রিত বিষয়ভোগে উন্মত্ত হয়ে সময় নষ্ট করে চলেছি আমরা জীবনভোর। অথচ কলিতে জীবন সময় এমনিতেই স্বল্প, তাই সেই অতি স্বল্প জীবনসময়কে বিষয় বিষে জর্জরিত না করে অকপটতা অর্থাৎ সারল্য এবং শরণাগতির মাধ্যমে ব্যয় করলে জগৎজননীর করুণা লাভ করা যায় সহজেই। মহামানবের শিক্ষা ছিল সেটিই। যে পথে হাঁটলে আর বিভ্রান্তির কারণ রইবে না কোথাও। সর্বত্যাগী শিব হয়ে শ্মশান-বক্ষে বসে অনাবিল সারল্য এবং অখন্ড শরণাগতি প্রদর্শণ করে জীবকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন অর্ধশতকেরও বেশী সময় ধরে। তাঁর জীবনের সকল কর্মের কর্তাই ছিলেন তারা মা। আর তিনি শুধু চেয়ে, চেয়ে সেই লীলা প্রত্যক্ষ করে আনন্দিত হতেন অহর্নিশি।

শ্রীবামাচরণের কাছে বিভিন্ন ধরণের মানুষ আসবার কোনো বিরাম ছিল না। কিন্তু তারাপীঠের আশেপাশের গ্রামের মজুর, মুটে ইত্যাদি সাধারণ মানুষের সঙ্গে সঙ্গ করেও তিনি যেমন আনন্দ পেতেন, তারাও তাঁর সাহচর্য্যে আনন্দলাভ করত প্রচুর। তেমনি একদিন একাকী তাঁর শ্মশান আশ্রমে বসে আছেন শ্রীবামাচরণ, সেইসময় কয়েকটি ল্যাট মজুর নিজেরা মদ খেয়ে তাঁর জন্য এক হাঁড়ি নিয়ে এসে তাদের গ্রাম্য ভাষায় তাঁকে গোঁসাই সম্বোধন করে বলল, 'গোঁসাই, আপনার লেগে চারি লিয়ে আলছি, খেঁয়ে দেখুন জিনিষটো কেমন বটে ?' - অত্যন্ত খুশি হয়ে তাদের আনা মদের হাঁড়ি পান করলেন মহামানব। তারা তখন তাঁর সঙ্গ করতে, করতে তাঁর কাছে আবদার করলে তাদেরকে রামায়ণ শোনাবার জন্য। শ্রী বামাচরণ তখন অতীব সারল্যে তাদের কাছে রামায়ণ ব্যাখ্যা করতে উদ্যত হলেন।

চলবে

ধারাবাহিক

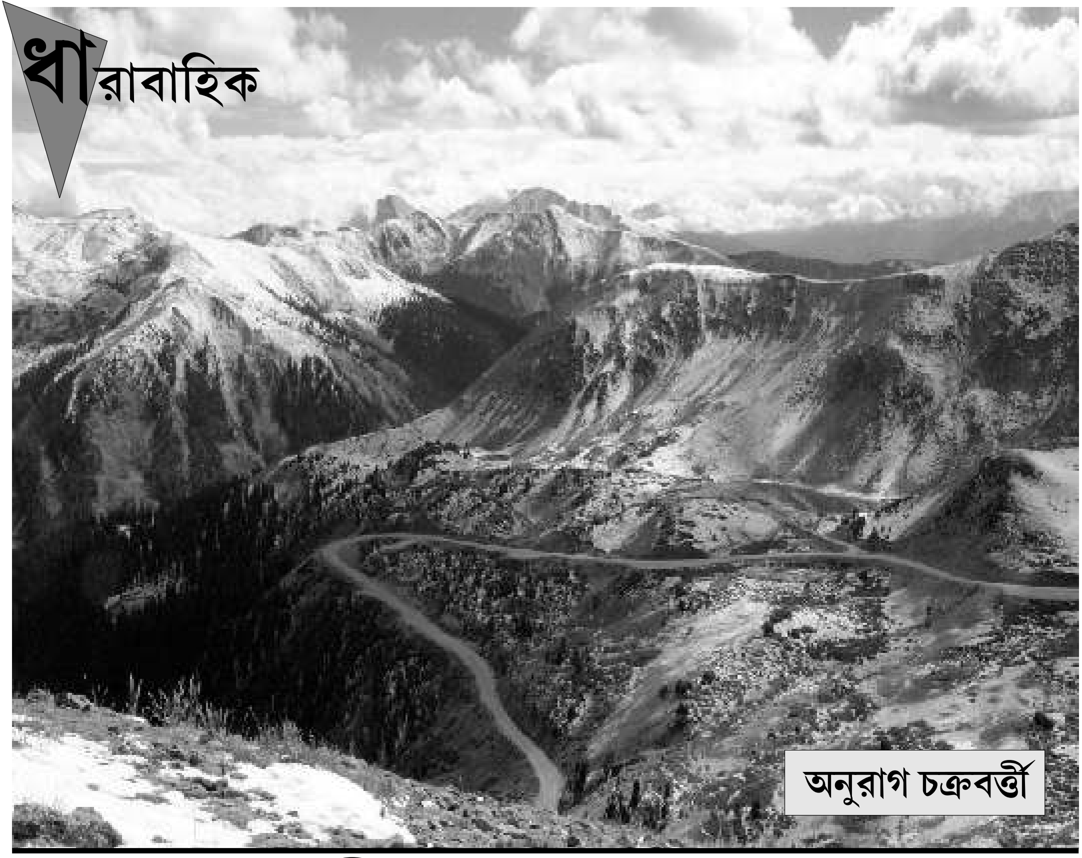

অনুরাগ চক্রবর্ত্তী

শ্রী তারাক্ষ্যাপা

আগের কথা ....

শ্রীগুরুদেবও তাই প্রিয় শিষ্যকে তাঁর বৈভব দিয়েছিলেন উজাড় করে। তন্ত্রে'র সকল গূঢ় তত্ত্ব সেই সকল । সাধারণ ভাষা দিয়ে সে সকল তত্ত্ব প্রকাশিতব্য নয় ।

শ্রীগুরুদেব ও শিষ্যের সম্পর্ক নিয়ে শাস্ত্রে অনেক ব্যাখ্যা রয়েছে , কিন্তু আদর্শ গুরু পাওয়া যেমন দুস্কর তেমনি আদর্শ শিষ্য মেলাও ভার ।তন্ত্রে'র সাধনা পূর্ণ মানব হওয়ার সাধনা। জীবদেহ নিয়ে সাধনা করে পরিশেষে শিবত্বে উপনীত হবার সাধনা । এপথে তাই শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে পরীক্ষা করেন বারেবারে । তাকে শতসহস্র পরীক্ষার সন্মুখীন করে তার শম, দম ও তিতিক্ষার পরিমাণ বৃদ্ধি করেন । শম অর্থাৎ অন্তরেন্দ্রিয়ের সংযম, দম অর্থাৎ বহিরেন্দ্রিয়ের সংযম এবং তিতিক্ষা অর্থাৎ ধৈর্য্য না রইলে

সাধনার বন্ধুর পথে চলবার জন্য অটুট ক্ষমতা তৈরী হয় না। অটুট স্বাস্থ্য প্রয়োজন সেজন্য এবং এরজন্যই সংযমের মাধ্যমে খাদ্যাভ্যাস এবং অন্যান্য রীতি নীতির প্রচলণ রয়েছে। কথিত আছে, চারটি বেদের মধ্যে নাকি শুধুমাত্র অথর্ব বেদেই তন্ত্রে'র বিস্তৃত উল্লেখ রয়েছে। তনু নির্ভর তন্ত্রে'র উপাস্য হলেন ভগবান শিব ও পার্ব্বতী অর্থাৎ উভয়ের উপাসনা বিস্তারকেই তন্ত্র নামে আখ্যা দেওয়া হয়। এ পথে অসাধারণ যোগ্যতা প্রয়োজন। সঠিক যোগ্যতা ব্যতিরেকে তন্ত্রপথে চলা খুবই কঠিন।

এ প্রসঙ্গে শ্রী তারাক্ষ্যাপা তথা শ্রীতারানাথ ব্রহ্মচারীর গুরুভক্তি সকল সাধকের জন্যই অনুকরণযোগ্য। শোনা যায়, তারাপুরের অদূরবর্তী রামপুরহাট থেকে তিনি কখনও গরুর গাড়ী চেপে সেখানে যাননি। সর্বদা পায়ে হেঁটেই গুরুগৃহে যাত্রা করতেন। একটি ক্ষুদ্র ঘটনার উল্লেখ করা যায় এই প্রসঙ্গে। গুরুগৃহে সাধন চলাকালীন একদিন বামদেব শ্রীতারানাথকে রামপুরহাটে পাঠিয়েছিলেন এক অধ্যাপক, জীতেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের বাড়ীতে। সেখানে পৌঁছে শ্রী গুরু কর্তৃক নির্দেশিত কর্ম অর্থাৎ জীতেন্দ্রবাবুর সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা শেষ হবার পরেই শ্রী তারানাথ মনে, মনে শ্রী গুরুদেবের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করলেন।

চলবে

শব্দকল্প

১			২		■	৩		৪
	■	■		■	■		■	
	■	■	৫	৬			■	
৭	৮	৯	■		■		■	■
■	১০		■	১১	১২		১৩	■
■		■	■	■		■		■
১৪	■	১৫	■	১৬		■		■
	■	১৭				■		■
১৮			■		■	১৯		

পাশাপাশি

১) রাবণ লঙ্কায় নিয়ে সীতাকে যেখানে রেখেছিলেন, ৩) গ্রীষ্মের প্রথম মাস, ৫) মহাদেব, ৭) চুপচাপ, ১০) বারি, ১১) স্বচ্ছ জলের বিশেষণ, ১৬) পৃথিবী, ১৭) বাঞ্জারা, ১৮) দেশীয়, ১৯) খাওয়ার অযোগ্য।

উপর নীচ

১) মা দুর্গার এক রূপ, ২) সবুজ, ৩) শিবনিবাস, ৪) পাদুকা, ৬) কপাল, ৮) মুক্তা, ৯) শক্তি, ১২) রাবণ, ১৩) সীতা যে রেখা অতিক্রম করেছিলেন, ১৪) সবকিছু, ১৫) কামমোহে যে রাজা নিজ পুত্রের যৌবন লাভ করেছিলেন, ১৬) গর্ত।

গতবারের উত্তর

প্র	ম	থে	শ	■	জ	য়	দ্র	থ
ণ	■	■	কু	■	য়া	■	ব	■
ব	র্ষ	রা	ন্ত	■	বি	■	ণ	■
না	■	■	লা	■	জ	রা	■	■
দ	ন্ত	রা	■	দ	য়া	ম	য়	■
■	■	ই	■	র	■	ন	■	ন
গ	জ	মো	তি	■	ল	ব	■	নী
র্হি	■	হ	র	ণ	■	মী	রা	■
ত	প	ন	■	■	■	■	ই	ক্ষু

ধারাবাহিক

অরণী মিত্র

ব্রজবিদেহী মহন্ত মহারাজ শ্রী ১০৮ স্বামী রামদাস কাঠিয়াবাবা

আগের কথা ....

তারা সেই দৃশ্য দেখে তৎক্ষণাৎ নবাবের কাছে ফিরে গিয়ে সংবাদ দিলে যে , 'হুজুর , একজন জটাজুটধারী তেজস্বী সন্ন্যাসী এই শঙ্খবাদন করছেন ।'

পারিষদবর্গের কাছে এই সংবাদ পাওয়া মাত্র সেই নবাব অত্যন্ত বিরক্ত হয়েই বললেন যে তাঁর মনে হয় সেই ব্যক্তি অতিশয় ধৃষ্ট, কারণ সে তার আদেশ অবজ্ঞা করেই এমন কাজ করেছে । নবাবের আদেশের অমর্যাদা করেই তাঁরই বাসভবনের নিকটসত তালের উপর বসে এইরকম ভাবে শঙ্খধ্বনি করে চলেছে ! তাই আরো ক্ষিপ্ত হয়েই নবাব তাদেরকে বললেন , যে আমার আদেশ উলঙ্ঘন করে আমারই

ভবনের কাছে তালের উপর বসে এইরকম শঙ্খধ্বনি করছেন ! সেই অতিশয় ধৃষ্ট ব্যক্তির এমন অপরাধ বরদাস্ত করা চলবে না কিছুতেই । সুতরাং পারিষদগণ সেই অবিলম্বে সেই ব্যক্তির শিরচ্ছেদ করুক অথবা তাকে ধরে নিয়ে আসুক নবাবের সম্মুখে ! - নবাবের অনুচরেরা তখন অনেক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে শ্রীদেবদাসজী যেখানে উপবেশন করেছিলেন সেই স্থানে গেলেন । কিন্তু সেখানে গিয়ে তারা কোনো জীবিত মানুষের সন্ধান পেলেন না । দেখলেন সেই সাধুর মুন্ড এক জায়গায় , হাত - পা ইত্যাদি দেহের বিবিধ অংশই খন্ডবিখন্ড হয়ে বিভিন্নভাবে ছড়িয়ে পড়ে আছে । এই দৃশ্য দর্শণ করে সেইসব অনুচরেরা পুনরায় নবাব ভবনে ফিরে গিয়ে নবাবকে এই সংবাদ দিল , যে অপর কেউ তারা যাবার আগেই সেই সাধুর শরীর খন্ড খন্ড করে কেটে ছড়িয়ে রেখেছে । কিন্তু তাদের সেই সংবাদ প্রান করবার পর পুনরায় শ্রীদেবদাসজী কর্তৃক শঙ্খধ্বনি শোনা গেল । আবার একইপ্রকার শঙ্খধ্বনি শোনা গেলে নবাব অনুচরদিগকে সেই স্থানে পুনরায় পাঠিয়ে দিলেন । কিন্তু তারা এইবার সেখানে এসে দেখল যে সেই স্থানে তাদের আগের বার দেখা কোনো ছিন্নবিচ্ছিন্ন মানুষের শরীরও যেমন পড়ে নেই সেইরকম অপর কোনো মানুষের অস্তিত্বও সেখানে নেই । তখন

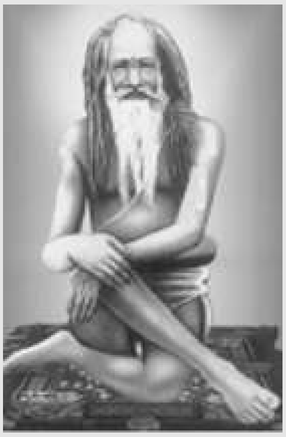

এই ঘটনায় নবাব কিন্তু ভীত হলেন এবং মনে করলেন যে যিনি যে যিনি এইরকম শঙ্খব্যদন করছেন তিনি কোনো অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন সিদ্ধ মহাপুরুষই হবেন ।

তারা অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে নবাবের কাছে গিয়ে সেই সংবাদ দিলেন কিন্তু তার পরবর্তী মুহূর্তেই আবার সেইস্থান থেকে পুনঃপুনঃ শঙ্খব্যদন হতে লাগল । এই ঘটনায় নবাব কিন্তু ভীত হলেন এবং মনে করলেন যে যিনি যে যিনি এইরকম শঙ্খব্যদন করছেন তিনি কোনো অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন সিদ্ধ মহাপুরুষই হবেন । অতএব তাঁর সঙ্গে বিরোধ করলে রাজ্যের ক্ষতি হওয়া অসম্ভব নয় । সুতরাং তাঁকে প্রসন্ন করতে এবং যাতে তিনি অভিশাপবশতঃ সেই রাজ্যের কোনো ক্ষতি না করেন সেই কারণে এবার নবাব তাঁর পারিষদগণের সঙ্গে নিজেই চললেন সেইস্থানে ।

ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম শক্তি সম্পন্ন মহর্ষিদের পরিচয় জানেন না এমন কোনো শাসনকর্তা কোনো সময়েই ভারতবর্ষে ছিলেন না । তাঁরা জাতি, ধর্ম , বর্ণ ইত্যাদি ভুলেই সেই সমস্ত মহামানবদের আদেশ পালন করতে তৎপর হতেন । কারণ তাঁরা খুব ভালো করেই জানতেন , সেই সমস্ত মহামানবদের ক্ষমতা এমনই ছিল যে তাঁরা ইচ্ছামাত্রই প্রলয় ঘটাতে পারতেন আবার তাঁদের আশীর্বাদ জুটলে সমস্ত বাসনা পূর্ণ হওয়াও অসম্ভব ছিল না ।

চলবে

হিতোপদেশ থেকে

আগের কথা......

সুবুদ্ধি'র পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথা শ্রবণ করে দোলাচল মনে হরিণ ও শিয়াল তখন বেশ উদ্গ্রীব হয়েই কাকটিকে জিজ্ঞাসা করল,- সে কিরকম বন্ধু ? কাক সুবুদ্ধি তখন বলতে লাগল তখন সেই গল্পটি ,-

শিবানী মিত্র

ভাগীরথীর তীরে গৃধ্রকূট নামে পর্ব্বতে একটি বৃহৎ পর্কটী বৃক্ষ আছে। সেই বৃক্ষের মধ্যে একটি কোটরে জরদ্গাব নামে এক গৃধ্র বাস করত। দৈব দুর্ঘটনায় তার নখ ও চক্ষু বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সেই বৃক্ষে আরও প্রচুর পক্ষীর বাস ছিল। সেই সকল পক্ষীরা দয়া করেই তার জীবন রক্ষার্থে নিজেদের আহার থেকে কিছু আহার্য্য বস্তু নিয়ে তাকে প্রদান করত। সেই অন্ন দ্বারা সেই গৃধ্র জরদ্গাব জীবন ধারণ করত এবং সেই অন্যান্য পক্ষীদের শাবক গুলির রক্ষণাবেক্ষণও করত। এরপর একদিন দীর্ঘকর্ণ নামক এক বিড়াল পক্ষিশাবকগুলি আহার করবার জন্য সেইখানে উপস্থিত হইল। তাকে আসতে দেখেই পক্ষী শাবকেরা সকলে ভীষণ

ভয়ে কোলাহল করে উঠল। তাদের সেই কোলাহল শুনেই জরদ্গব জিজ্ঞাসা করল, - ও কে আসছে? আবার দূর থেকে দীর্ঘকর্ণ গৃধ্রকে দেখতে পেয়েই ভয় পেয়ে ভাবল, হায়! আমি মারা পড়লাম, অথবা-

যাবত বিপদ নাহি উপস্থিত হয়,
তাবত বিপদ বলি' করিবেক ভয়;
বিপদ আসিলে কিন্তু ত্যাজি ভয় মনে,
প্রতিকার তাহার করিবে প্রাণপণে ।।৫৮।।

এতক্ষণে অত্যন্ত নিকটে এসে পড়েছি, আর পালিয়ে যাওয়াও দুস্কর । সুতরাং উপস্থিত মত কার্য্য করা যাক! ভাল করে বিশ্বাস উৎপাদন করে এর সামনে যাওয়া যাক্। মনে মনে এইসব অনেক কিছু ভেবে সামনে গিয়ে বলল, 'হে আর্য্য, আপনাকে নমস্কার করি। গৃধ্র বলল, কে তুমি? সে উত্তর দিল , আমি বিড়াল। গৃধ্র বলল, দূর হও, নতুবা তোমার প্রাণসংশয় করব। বিড়াল বলল, আগে আমার কথাটাই শুনুন, তারপর যদি আপনার মনে হয় আমি বধযোগ্য ! তখন আমাকে বধ করবেন। কারণ,-

জাতিমাত্রে কেহ কারো বধ্য পূজ্য নয়,
ব্যবহারে বধ্য কিংবা পূজনীয় হয় ।।৫৯।।

গৃধ্র তখন সেই বিড়ালটিকে ডেকে বলল, - বল! তুমি কি জন্য এখানে এসেছো? বিড়াল তখন ছলনা করে বলল, আমি এই গঙ্গা তীরে বাস করি, নিত্য স্নান করি ও নিরামিষ ভোজন করি এবং কঠিন ব্রহ্মচর্য্য পালন করেই আমি এবার চান্দ্রায়ণব্রতের অনুষ্ঠান করছি। আপনি ধর্মজ্ঞ ও প্রেম ও বিশ্বাসের পাত্র, পক্ষীরা সর্ব্বদাই আমার কাছে এসে আপনার এইরকম গুণ কীর্ত্তণ করে থাকে। এই জন্য আমি আপনাকে জ্ঞানে ও বয়সে বড় জেনেই আপনার কাছে ধর্ম্মকথা শুনবার জন্য এই স্থানে এসেছি। কিন্তু আপনি এমনিই ধর্মজ্ঞ যে, আমি অতিথি হয়ে এসেছি , আর আমাকেই বধ করতে উদ্যত হয়েছেন। শাস্ত্রে গৃহস্থ্যের ধর্ম্ম এইরূপ কথিত আছে;-

পরম শত্রুও গৃহে হ'লে উপস্থিত,
অতিথি সৎকার তার করিবে উচিত;
পাশে আসি কাঠুরিয়া করিছে ছেদন,

তবু তারে বৃক্ষ করে ছায়া বিতরণ।।৬০।।

আর যদি ঘরে অন্ন না থাকে, তবে সুমিষ্ট বাক্যেও অতিথির পূজা করা যায়। কথিতও আছে যে, -

তৃণ, ভূমি, জল আর সুনৃত বচন,
ইহাও ত সাধুগৃহে পাকে সর্বক্ষণ।।৬১।।

সে আরো বলে চলল যে ,-

গৃহাগত বাল বৃদ্ধে করিবে সন্মান,
অভ্যাগত সকলেরি গুরুর সমান ।।৬২।।

তারপর একটু থেমে আবার বলল -

নির্গুণ জনেও দয়া সাধুগণ করে;
চন্দ্র কি দেয় না আলো চণ্ডালের ঘরে ?।।৬৩।।

- গৃধ্র মন দিয়ে তার কথা শুনছে দেখে সুযোগ মত আরো কথা বলতে লাগল বেড়ালটি। সে বলে চলল যে , কথিত আছে যে,-

অতিথি যদ্যপি আসি' কাহারো ভবনে,
হতাশ হইয়া ফিরে যায় ভগ্ন মনে;
আপন দুষ্কৃত তারে সে করে অর্পণ,
তাহার সুকৃত লয়ে করয়ে গমন ।।৬৪।।
নীচও আসিলে শ্রেষ্ঠ জাতির ভবনে,
তাহাকেও যথাযোগ্য পূজিবে যতনে
একমাত্র অতিথি সে সর্ব্বদেবময়,
অতিথিপূজায় সর্ব্বদেব পূজা হয়।।৬৫।।

চলবে

(হিতোপদেশের প্রাচীণ তথ্য অনুসারে)

গত যে মাসের সংখ্যায় তীর্থ-প্রান্তে 'তাঞ্জোর' নিয়ে লেখাটি ভীষণ ভালো লাগল এছাড়া এই সংখ্যায় 'নারদ' -এর উপর লেখাটিও খুব সুন্দর। জ্ঞান-আলোকে মাঝে মাঝে বেশ নতুন ধরনের লেখা চোখে পড়ে। আপনাদের প্রয়াসকে সাধুবাদ জানাই।

কুণাল মাইতি
কাঁথি

জ্ঞান-আলোকে সত্য ঘটনা অবলম্বনে শ্রী শ্রী জ্ঞানবাবার উপর যে ধারাবাহিকটি প্রকাশিত হয় তা পড়ে অন্তরের যে উপলব্ধি আমার হয় তা প্রকাশের কোন ভাষা আমার নেই। শ্রী শ্রী বাবার চরণে শতকোটি প্রণাম জানাই ।

কবিতা সাহা
লিলুয়া

Woman Work Training

The foundation would like to provide training facilities for the poor, unfortunate women of the society by establishing training centres for them. Many of the women who live from hand to mouth and are at the mercy of others will get the opportunity to learn different useful trades at the training centres. This training will be provided to them free of cost, and they will also be provided with food and lodging, if necessary, during the training period.

Adult Education

The foundation has plans to teach the three R's to the unlettered in the remote villages, by sending teams of volunteers to those places. Besides teaching the illiterate how to read and write, the purpose of the volunteers will be to teach them different trades as their means of livelihood. The foundation will help the trained persons to get themselves established by supplying them the necessary tools and funds.

Orphanage

We would like to establish orphanages at different places within the country and abroad with the sole purpose of bringing up the unfortunate parentless children in a very cordial atmosphere. As children of the universal mother they will be treated with love and care, and no pains will be spared to develop their innate talents and qualities.

In order to establish and run the orphanages, our foundation will need a regular inflow of funds. It is not the foundations intention to go begging to Government officials and NGO's for grants and contributions. The members and well-wishers of the foundation have committed themselves to supply the essential things needed and bear the basic expenditure. We are confident that, once the orphanage project starts functioning, kind and benevolent people will be attracted to it and would like to extend their cordial support. Will it not be wonderful to watch the children of the universal mother grow up to be ideal citizens of the world ?

GYAN-ALOKE(BENGALI MONTHLY), VOL- 6, ISSUE 8 RNI NO. WBBEN/2012/42501 KOL RMS/466/2015-2017